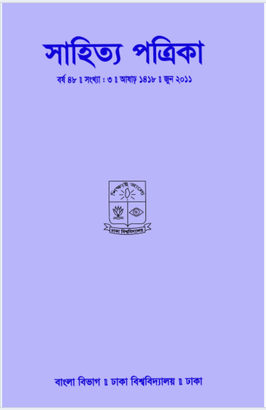

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহসান হাবীবের সারাদুপুর : সময়ের শিল্পকথা

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.2
Pages	৩১-৪৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আহ্সান হাবীবের *সারাদুপুর* : সময়ের শিল্পকথা

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের কবি আহসান হাবীব বাংলাদেশের কবিতার পথ-নির্মাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার প্রধান চারিত্র্য মানবতাবাদী দায়বদ্ধতা। আহসান হাবীব এ-ধারার কাব্যের প্রধান রূপকার। বলা চলে, আহসান হাবীবই চল্লিশের কবিদের মধ্যে একমাত্র, যিনি বিচিত্র অনুষঙ্গে কবিতাকে সামাজিক অঙ্গীকারের সঙ্গে একীভূত করতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তির অস্তিত্ব-সংরাগ, আত্মপরিচয়গত সংকট (আইডেনটিটি ক্রাইসিস), মাটি-মানুষের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ। সুগভীর অস্তিত্বসংকটে আধুনিক মানুষের অনিকেত চেতনা তাঁর কাব্যে রূপাবয়ব লাভ করেছে। স্বদেশ, মৃত্তিকামূল, মানুষ, ঐতিহ্য এবং প্রেম আহসান হাবীবের কবিতার প্রধান উপজীব্য। তাঁর কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কবির অস্তি-বোধ। ব্যক্তি ও সমাজের টানাপড়েন, দায়বদ্ধতার সূক্ষ্মতাবোধ, নৈর্ব্যক্তিকতা, অস্তিচেতনা, ব্যঙ্গসংশ্লেষী ও প্রতীকী ভাষারীতি তাঁর কবিতাকে আধুনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ-সূত্রেই তিনি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কবিতায় উপজীব্য করে তুলেছেন রাষ্ট্রনীতি, প্রেমচেতনা, জীবনবোধ এবং স্বদেশচেতনামূলক নানা অনুষঙ্গ।[১] আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির নাগরিক চেতনা। এ-শেকড় নিহিত মূলত কবির নগরকেন্দ্রিক জীবনে।

> রাজধানী কলকাতা থেকে আরেক রাজধানী ঢাকা। পঞ্চাশের দশক থেকে আহসান হাবীব আমৃত্যু নগরবাসী। এখানেও রাজপথ তাঁকে একনিষ্ঠ আকর্ষণে বেঁধে রাখতে পারেনি, যদিও সঙ্কটে, আবর্তে রাজপথের ডাক কবি কখনও উপেক্ষা করেননি। বাহান্ন যেমন তার কবিতাকে নাড়া দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে আরো ব্যাপকতায় ষাটের দশকের উত্তাল দিনগুলো।[২]

আর দেশবিভাগোত্তর স্থানান্তরের ফলে কবি-চৈতন্যস্রোতও বিজড়িত হয়ে যায় নানান অনুষঙ্গে —

> এখানে এসে চল্লিশের সমাজচেতনায় গড়ে-ওঠা নাগরিক চরিত্র পালল মাটির দুঃখ দুর্দশার টানে উদ্বেল হয়ে ওঠে। এই মাটি, এই জীবন তাঁকে ভিন্নতর ভাষাশৈলী ও শব্দাবলীর জগতে নিয়ে যায়, যা কখনও তার অচেনা ছিল না। এবার সে পথে পা দিতে গিয়ে পালল বঙ্গের জলস্রোতে পাড়ি জমিয়ে কবিচৈতন্য তার অস্বিষ্টকে সুস্পষ্ট দেখতে পায়। চোখ মেলতেই দেখা যায় তথাকথিত 'শান্তির নীড়ে' তার স্বজনদের দিনরাত্রি এক অদ্ভুত আঁধারে ঢাকা — খালেক নিকিরি কিংবা ভুবন কামার সেই থকথকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এই দেখার আলোতেই কবি তার পথের সন্ধান পেয়ে যান। রাজপথের কবির আরেক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে। ভূগোল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই প্রত্যাবর্তন সহজ হয়ে ওঠে।[৩]

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আহসান হাবীবের কবিমানসের বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে উপর্যুক্ত বক্তব্য যেমন প্রণিধানযোগ্য অন্যদিকে নগর কলকাতায় পরিবর্ধিত এই কবির কৈশোরক সাহিত্যাঙ্গনও গভীরভাবে বিবেচ্য। সময়টা উত্তাল। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকাল, মন্বন্তর, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন সর্বোপরি দ্বিজাতিতত্ত্বের আলোকে পাকিস্তান আন্দোলন। ত্রিশের অনুবর্তী, তিরিশি মনন ও মানসিকতায় পুষ্ট এ দশকের কবিরা ত্রিশের কবিদের সঙ্গে দূরান্বয় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁদের পারম্পর্য ও পরিপ্রেক্ষিত চেতনায় এবং বিশ্লেষণমূলকতায়। চল্লিশের কাব্যপ্রবণতার দুটি মূল স্রোত ইসলামি ধারা ও মানবতাবাদী প্রগতিশীল ধারা কার্যকর থাকলেও আহসান হাবীব মূলত দ্বিতীয় ধারারই একজন প্রধান কবি। আসলে চল্লিশের কবিদের মধ্যে যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছিল সেটি ছিল এ নতুন ভূ-খণ্ডে নিজেদের আত্মপরিচয়গত সংকট। নতুন রাষ্ট্রে অবস্থান, এক ধরনের দোদুল্যমানতা কবিদের আক্রান্ত করেছিল। স্পষ্টত তাঁদের কাব্যাদর্শ দ্বিধাবিভক্ত। সাত-চল্লিশ পরবর্তী দেশবিভাগোত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যে ইসলামি ধারার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা মূলত সামন্তবোধলালনকারী মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণিরই প্রতিনিধি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলেও বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীশ্রেণির মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রবল স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সঙ্কট —

> বস্তুত লাহোর প্রস্তাবের পর বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী, সামন্তশ্রেণী ও নব্য ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল অনিশ্চিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সঙ্কট থেকে নিরাপদ ভাগ্যের জন্যে। বহিরাগতদের নেতৃত্বাধীনে তারা যে নবতর প্রতিযোগিতায় সঙ্কুচিত ও উন্মুলিত হবে, সেটা ছিল তাদের দৃষ্টি বহির্ভূত।[৪]

রাজনৈতিক এবং আর্থনীতিক বৈষম্যের পাশাপাশি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশটিও হয়ে পড়েছিল দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্বসংকুল। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বলগ্নের সামন্তবোধলালনকারী বুদ্ধিজীবীশ্রেণি নতুন রাষ্ট্রেও নিজেদের সেই মানসিকতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন। সামন্ত মূল্যবোধের ধারক, ইসলামি ভাবধারার এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণি বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি করলেন — পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭), পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২), রওনক সাহিত্য সংস্থা (১৯৫৮) প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতির গঠন। কিন্তু ৪৭-পরবর্তী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে আবির্ভূত লেখকবৃন্দের একটি অংশ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অখণ্ডরূপেই গ্রহণ করতে চাইলেন। আহসান হাবীব এ গোত্রের প্রধান কবি। এ নবতর লেখকদের সঙ্গে পাকিস্তান-আন্দোলনকারী শিল্পী-সাহিত্যিকদের চিন্তা ও মতের পার্থক্য ছিল ব্যাপক। ইসলামি ভাবধারার সঙ্গে একাত্ম চল্লিশের দশকের সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য তথা আরব্য রজনী, ইসলামি চেতনামূলক কবিতা নিয়ে নবজাগরণের স্বপ্ন দেখলেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এ-শ্রেণির মতবাদ স্পষ্ট হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরপরই ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে ইসলামি ভাবধারা ও সংস্কৃতির আদলে, আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্যে এঁরা তাঁদের সাহিত্যে মতাদর্শ তুলে ধরতে চাইলেন। কিন্তু অন্য ধারার কবি-সাহিত্যিকেরা বাংলা কবিতা, বাঙালি সংস্কৃতি, মানুষ ও জনপদের ইতিহাস, সভ্যতা ও পারম্পর্যকে অখণ্ড সংস্কৃতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সমালোচকের বক্তব্য উদ্ধার করে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যাক :

> আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন প্রমুখ সমাজ-কাল-জীবনকে তুলনামূলকভাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হলেন — তাঁদের কাব্যভাবনায়, চিত্রকল্পে, রূপকে, উপমায় আর স্বাতন্ত্র্যকামী কণ্ঠস্বরে। তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, সঙ্কট, অবরোধকে উপলব্ধি করেন অন্তরঙ্গ আলোকে। পাকিস্তানের স্বপ্ন তাঁদের উৎসাহিত করেছে, তবে অন্ধ ও মুগ্ধ করেনি।[৫]

আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখ কবি নতুন রাষ্ট্রের কাব্যাদর্শের ভাবমঞ্চটি প্রস্তুত করেন। এ গেল রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত, কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় তিরিশি কবিদের যে প্রবল প্রতাপসহ নাগরিক আধুনিক কবিতার পত্তন ও ইউরোপীয় চেতনায় নতুন চক্ষুর উন্মীলন ঘটেছে, তার প্রভাবও দিগন্তবিস্তারী হল। কবিতার ভাষা, বিষয়, আঙ্গিক এবং চেতনায় যে রূপান্তর সূচিত হল পরবর্তীকালের কবিদের জন্য তা হল প্রায় অনুকরণীয়। কারণ, মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নাগরিকতার আতীব্র উপহাস তিরিশের কবিরা যে চিত্রিত করেছেন কবিতায়, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাবীন্দ্রিক শাশ্বত প্রেমের রোমান্টিক আবহে কাব্যরচনাও কারোর অভিপ্রেত থাকার কথা নয়। সুতরাং তিরিশের কবিরা যে সমাজবিমুখ আত্মনিমজ্জনে নৈরাশ্যবাদী হয়েছেন, এলিয়টীয় নাগরিক উদ্ভটতাকে বিন্যাস করেছেন, এমনকি বাংলা সাহিত্যে নাগরিক কবিতার যে ডিসকোর্স রচনা করেছেন, আহসান হাবীব সে উত্তরাধিকারকেই গ্রহণ করেছেন। তবে, চল্লিশের সাম্যবাদী ধারার যে সমাজ-লগ্ন কাব্য-ঐতিহ্য সূচিত হয়েছিল বিষ্ণু দে বাহিত সমর-সুভাষের হাতে তারও অস্তিবাচক কাব্যবোধও তিনি আত্মস্থ করেছেন বলে মনে হয়। সুতরাং আহসান হাবীবের কবিতা নগর কলকাতার সাহিত্য-ঐতিহ্যকে কেন্দ্রীভূত করে বেড়ে উঠলেও দেশবিভাগোত্তর নতুন রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবার ফলে স্বকাল, রাজনীতি, দেশকাল ও জনমানুষের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন বাকভঙ্গির সৃষ্টি করে। আজকের বাংলাদেশের কবিতার যে প্রধান ধারা বিকশিত তার পাটাতন নির্মিত হয়েছে তাঁরই হাতে। এ-কারণে আহসান হাবীবের কবিতায় আছে মানুষ, পরম যত্নের এই বঙ্গেরই কিষাণি, বহমান নদী, নদীস্রোত, আছে নস্টালজিয়া, অবারিত প্রকৃতি, উত্তরণ আর উত্তরণের স্তরময় ইতিহাস। গভীর অস্তিবোধে কবি তাঁর শেকড়কে খুঁজেছেন, ধাবমান কালের অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যঙ্গ করেছেন, স্পষ্টত অবস্থান নিয়েছেন ইতিবাচক উত্তরণের পক্ষে। উলম্ব নাগরিকতার মধ্যে থেকেও তিনি বিস্মৃত হন নি প্রকৃত নগর-সভ্যতার কাঠামোকে, সামষ্টিক জীবন-ব্যাপ্তির শক্তিমত্তাকে। অস্তিত্বের বাহক এই কবি দায়বদ্ধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সময়স্রোতের পৃষ্ঠদেশে প্রত্যক্ষ করেছেন কালের বিকার। সুতরাং *রাত্রিশেষ* (১৯৪৭) কাব্যের মধ্যে যে তমো-অবসানের সূচনা ও স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সেই ধারায়ই পরবর্তীকালে উত্তরণের পথে তিনি এগিয়েছেন। *সারাদুপুর* (১৯৬৪) কবির আপরাহ্নিক জীবন-অতিক্রান্তের সাক্ষ্য বহন করলেও স্বগতোক্তির মতোই কবির শিল্পময় অনুধ্যানের স্মারক হয়ে উঠেছে। এই অর্থে *সারাদুপুর* আহসান হাবীবের শিল্পের আরাধনার জগতে অনুপ্রবেশের প্রথম সোপান। *রাত্রিশেষ* কিংবা *ছায়াহরিণ*-এর (১৯৬২) কবির মধ্যে যে গণ-সম্পৃক্তি, মৃত্তিকামূল ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরাবরণ সাবলীল প্রকাশ, *সারাদুপুর*-এ এসে সেই বোধ ও প্রতীতী অনেকটাই উপমা, রূপক-প্রতীকাচ্ছাদিত। মনে হয় গণ-উত্তরণের পথ ধরে এই পর্বের কবি চলে যাচ্ছেন আত্মগত ধ্যানের জগতে; কবিতার

অতলান্তিক রহস্যময়তার জগতে। ফলে পারিপার্শ্বিকের বহুপরিচিত জনপদের মানুষের মুখ নিত্য কিষাণির রূপাবয়ব আহসান হাবীবের চেতনায় পরিস্ফুট হয় 'প্রাণের পুতুল' হিসেবে। আসলে নাগরিক জীবনে ইতোমধ্যে ধাতস্থ ও অভিযোজিত কবিসত্তা কৃত্রিম নাগরিক পুতুলের প্রতীকেই তাঁর চৈতন্যকে খুঁজে পায় —

পুতুল যদিও
তবু
হেমন্তের বিকেলের রোদে
মুখ মুছে
নিজ হাতে তুলে নেয়
সোনামাখা ধানের মঞ্জরী দু'চারিটি
যদিও পুতুল।

(পুতুল)

এই পুতুল আহসান হাবীবের *সারাদুপুর* কাব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কবিরই জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতীকী রূপাবয়বে। আতীব্র নাগরিকতায় ধ্বস্ত মানুষের জীবনচক্রের মধ্যে যখন মানবিকতাই বিনষ্ট তখন আত্ম-প্রতিবিম্বায়নের সূত্ররূপে পুতুলকেই কবি আরাধ্য করেন। নিয়তি ও কর্মমুখরতায় সদাচঞ্চল কাল-পরিক্রমণে এই পুতুলই মূলত মানুষের শেকড়। কৃষিজীবী মানুষ ক্রমশ যে নগর-সভ্যতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে তার সাফল্যের পিছনে যাদের শ্রম ও স্বেদ জড়িয়ে রয়েছে তার কেন্দ্রানুগ অনুষঙ্গ মূলত গ্রামীণ কিষাণী —

পুতুল।
দু'হাত ভ'রে সারাদিন ফসল কুড়িয়ে
আদিম স্রোতের ঢেউয়ে হাত ধুয়ে
বিশ্রামের আয়োজন
আর
যে আছে আদিম সঙ্গী — তার
অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে
নিজ হাতে খোঁপায় সাজায়
রাণী সাজে।

আবার, এই পুতুলই কবির দ্বৈতসত্তার সম্প্রকাশক হয়ে ওঠে। নাগরিক ছদ্মাবরণের অন্তরালে কৃত্রিমতায় —

এবং দুজনে
বৈষয়িক বন্দরে অথবা
শৌখিন মেলার কোনো সজ্জিত সারিতে
অথবা কখনো
পলাশপ্রসন্ন এই মাঠে মাঠে
বৈকালিক ভ্রমণের ছদ্মনামে
সঙ্গে করে আনিনি কি

আমাদের আজন্ম অবুঝ সঙ্গীদের
সেই দুটি পুতুল
যাদের
সারা দেহে আমাদের গোপন প্রশ্রয়
উজ্জ্বল আভায় জ্বলে?

(স্বরূপে মহিমা তার)

আহসান হাবীব আবহমান বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানেন। কবি শ্রেণি-সংগ্রামের ইতিহাস থেকে মানব-ইতিহাসের পরম্পরার পাঠও নিয়েছেন। কবি জানেন, যূথবদ্ধ জীবন ও সরল দিনাতিপাতের আবর্তে মানুষ প্রকৃতিলগ্ন ছিল। প্রকৃতির গভীর সংযোগে গড়ে উঠেছিল মানবিক শৃঙ্খলার সেতুবন্ধ। কিন্তু, বেসাতি, মুদ্রানির্ভর সভ্যতা ও বণিকী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে মানুষের আবাস ভেঙেছে, নতুন আবাসন উঠেছে। মানুষের কৃষিমুখী, হাটুরে জীবন ও সামান্য বিকিকিনি ধ্বংস হয়ে নদীর জোয়ারে কূল ভেঙে অন্য নদীর পারে অতি যান্ত্রিকতায় জীবনের পত্তন ঘটেছে—

মনে পড়ে এক ছোট হাট
সামান্য পশরা
সামান্য দু'এক কড়ি হাতে নিয়ে বটের ছায়ায়
বেচাকেনা।
দুই ধারে সবুরেখা জলের আর্শিতে
মুখ দেখে আসা যাওয়া সরু পথে
সব মনে পড়ে।

(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

সুতরাং, এতে মানুষের অগ্রযাত্রা ভুল পথে সরে গেছে। মানুষ হারিয়েছে প্রকৃতির স্বাভাবিকত্ব। যে সভ্যতার পত্তন ঘটল তার পরিণামও ভুল।

আর জানে মন,
এই অবারিতদ্বার
প্রেক্ষাগারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে; এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

মানবসভ্যতা এগিয়েছে। এই এগুনো সভ্যতা ও তার অহংদৃপ্ত গতিভঙ্গি আহসান হাবীবের কবিতায় ধরা পড়েছে। কিন্তু কবি এর পরিণাম নিয়ে সংশয়মুক্ত নন। পুরনো নদীর মৃত্যু ও নতুন নদীর তীরে যে বণিকী ও ধনবাদী সমাজব্যবস্থা তার মধ্যে আছে শোষণ ও প্রবঞ্চনা—

সোনার কৌটোয় কিম্বা হীরের কৌটোয়
আমি তাকে দেখে খুশি নই
অথবা যখন মালা কিম্বা মুকুটের ছলনায় জড়ানো সে
আমি তার দুঃখে দুঃখী।

(এসো সঙ্গী হই)

আহসান হাবীবের এই দুঃখবোধ মূলত মৃত্তিকা-বিলগ্ন শহরকেন্দ্রিক সভ্যতাকে ঘিরে। আধুনিক মানুষের অনিবার্য নিয়তি শহর অভিগমন এবং অনিবার্য অসহায়ত্ব শেকড়-বিচ্ছিন্নতা। এ-কারণেই এক ধরনের নস্টালজিয়া কবিকে উৎসমুখী করেছে। এই আবাস-চ্যুত সভ্যতার সম্প্রসারণে কবি তৃপ্ত নন। তিরিশের কবিদের চেয়ে আহসান হাবীব ব্যতিক্রম এই অর্থে, কবি শেষঅব্দি মানুষের পক্ষে, উৎকেন্দ্রিক সমাজ নয়, বরং সামষ্টিক উত্তরণকেই কবি প্রাধান্য দিয়েছেন।

সারাদুপুর কাব্যে কবির এই নগরসভ্যতার ক্রমসম্প্রসারণ এবং ধাবমান পুঁজিবাদী মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা ভাষারূপ পেয়েছে। 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা', 'এসো সঙ্গী হই', 'রোদে-মেঘে', 'উত্তীর্ণ প্রহরের গান', 'স্বজন', 'মন বলে' প্রভৃতি কবিতায় বেসাতি-বণিকী সভ্যতা, পুরনো সভ্যতা ভেঙে নতুন সভ্যতার পত্তন, আত্মমুখী উৎকেন্দ্রিক মানুষ এবং নস্টালজিক অনুভূতি ভাষারূপ পেয়েছে। 'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় মানুষের চাহিদা ও লালসার চিত্র করুণাসূচক হয়ে উঠেছে গ্রিক পুরাণ মাইডাসের আর্তির মধ্যে। ফ্রাইজিয়া দেশে রাজা মাইডাসের গোলাপ বাগানে সাইলেনাস নামক বৃদ্ধ প্রচুর মদ্যপান করে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজার প্রহরীরা ঘুমন্ত বৃদ্ধকে কৌতূহলবশত গোলাপ পাপড়ির মধ্যেই রাজার সম্মুখে উপস্থিত করলে রাজা তাকে আদর-আপ্যায়ন করেন। এতে মদের দেবতা বাক্কাস প্রসন্ন হন এবং মাইডাসকে বর প্রদান করতে চান; কারণ বৃদ্ধ সাইলেনাস বাক্কাসের অনুসারী ছিলেন। মাইডাস বাক্কাসের কাছে তিনি যা স্পর্শ করবেন তাই-ই যেন স্বর্ণে রূপান্তরিত হয় এই বর প্রত্যাশা করলে বাক্কাস তাকে এই বর প্রদান করেন। কিন্তু পরিণামে এই বর মাইডাসের জীবনকে দুর্বিষহ ও অভিশপ্ত করে তোলে। কারণ মাইডাস খাদ্যদ্রব্য, পানীয় যা-ই স্পর্শ করেন সেটি কঠিন-কর্কশ সোনায় রূপান্তরিত হয়। পরে নিজের এই লোভ ও নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতপ্ত মাইডাস এই দুরবস্থার অপনোদনে বাক্কাসের পরামর্শে পেক্টোলাস নদীর উৎস-স্থলে স্নান করে 'বর' তথা শাপমুক্ত হন। এ-প্রসঙ্গকেই কবি সাম্প্রতিক পুঁজি ও ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থায় আত্মমুখী মানুষের সম্পদলিপ্সাকে রূপায়িত করেন সমকালীন আবহে —

কেটেছে কৈশোর
কৈশোরের আরাধনা কখন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষ করে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের
সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিন রাত্রি। সোনায় কখন
পাহাড় তুলেছি গড়ে আর সেই পাহাড়ের গুহায় কখন
সোনার পালঙ্কে পাতা সোনার শয্যায়
ভুলেছি আপনজন আত্মীয় এবং
শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ; এবং একদা
দেখি এ হৃদয় কবে এক খণ্ড বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত।

এ-কথা সত্য, *রাত্রিশেষ* কিংবা *ছায়াহরিণ* কাব্যের প্রত্যক্ষভাষ ও সমাজনিষ্ঠ কবিতার পাটাতন থেকে আহসান হাবীব *সারাদুপুর*-এ কবিতার শিল্পৈষণাময় কারুকৃতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। তুষার দাশ অবশ্য বলেছেন, 'যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি কাব্যরচনা শুরু

করেছিলেন, যে নিরলস মানব-সাধনা ও সমাজ-সম্পৃক্তি তাঁর অন্বিষ্ট ছিল — সেখান থেকে তিনি এ কাব্যে বিচ্যুত হয়েছেন। বিচ্যুত এ কারণে যে, তাঁর আগেকার সেই সহজ সারল্য নেই। ধীরে ধীরে তিনি খুব বেশি করে ঝুঁকেছেন শিল্পের দিকে। আর যতবেশি শিল্পের দিকে তাঁর ঝোঁক বেড়েছে, ততই তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছেন মানুষ থেকে। এই বিচ্ছিন্নতার জন্যে দায়ী তাঁর সামাজিক অবস্থান।'[৬] কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বিষয়টি শুধু সমাজ-বাস্তবতাই নয়। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। *সারাদুপুর* কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। আইউবি কাল দশকের নিপতিত অন্ধকারে বাকরুদ্ধ সময়প্রবাহে বাংলাদেশের আরো অনেক সাহিত্যিকই এ সময়-পর্বে রূপক ও প্রতিরূপকাশ্রয়ী জগতের মধ্যে আত্ম-উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন।[৭] আহসান হাবীবও সম্ভবত এ-কারণেই শিল্পের গহন রহস্যময়তায় নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। আর কবিতা প্রত্যক্ষ সমাজ-সংশ্লেষী চেতনার না হয়ে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি অন্তর্মনস্ক। এই কাব্যে আহসান হাবীব, ইতিহাস, অতীত, চলমান সভ্যতা, জনজীবন, মৃত্তিকা ও শেকড়ের সন্ধানে পরিভ্রমণ করেছেন। নগর সভ্যতার পত্তন এবং পুরনো জনপদ ও সভ্যতার ক্ষয়, মূল্যবোধজনিত মানবপ্রজন্মের অবক্ষয় ও অন্তঃসারশূন্যতাকে গভীর সংবেদনায় প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যে কবির বোধের সম্প্রকাশক হয়ে উঠেছে কবিকৃত নতুন প্রতীক উপমা ও রূপকান্বেষণ। প্রায়শই, পুতুল, নদী, প্রবহমান নদী, নদীর ঘাট, জোয়ার, সাম্পান, তরী, পালক, ভোর এসব অনুষঙ্গ কবি ব্যবহার করেছেন কবির নতুন কাব্যাঙ্গিকের প্রয়োজনে।

নদী আহসান হাবীবের কবিতায় প্রবহমানতার প্রতীক। এই নদী সভ্যতার পত্তনের বীজও। *সারাদুপুর* কাব্যে নদী অনিবার্য অনুষঙ্গ। জীবন ও জনপদের পরিবর্তনমুখিতা, সভ্যতার বিকাশ, নগরায়ণ কিংবা মূল্যবোধগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসাবে নদী, বহমান জল, গতিরুদ্ধ নদীস্রোত অবয়বময়তা পেয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

১.
দেখি চলো, নতুন নদীর তীর ঘেঁষে কারা হাঁটে
সামনে কার অমরতা একটি নবযুবার ভঙ্গিতে
হেঁটে যায়।

(এসো সঙ্গী হই)

২.
মরা নদী পার হতে হতে দেখো দেখো
ফিরে ফিরে এখনও তাকায় সব মুখ

(ঐ)

৩.
যখন জোয়ার ছিলো
        ভরা নদী
ভোরের পাখিরা
প্রবাসের নীড় ছেড়ে নেমে গেলো,

(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

ভরা জোয়ার, নদীর ঘাট, বন্দর, সাম্পান প্রভৃতি *সারাদুপুর* কাব্যে কখনো কখনো যৌবন, সভ্যতার সমৃদ্ধি, পসরা, মুদ্রানির্ভর বণিকী সমাজ, প্রাত্যহিক জনচঞ্চলতা ইত্যাদির

পরিচায়ক। কবির শেকড়বিচ্যুতি উদ্বাস্তু সভ্যতার মধ্যে মানুষের স্বপ্ন নির্মাণকে ঘাট থেকে অন্য ঘাটে প্রত্যাগমনের মধ্যে প্রতীকায়িত।

১.
ঘাটের সাম্পান যায়
কাছে দূরে
বন্দরের খোঁজে —
(স্বজন)

২.
ভোর থেকে ভোরে
জোয়ারে জোয়ারে সত্যি আরো বহু অভিজ্ঞ বিষয়ী
প্রজ্ঞাবান গৃহস্থেরা আরো ফসল কুড়িয়ে
ফিরেছে যে যার ঘরে।
(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

৩.
শুক্‌নো ঘাটে জোয়ারের ডাক
আসুক, দুলুক নৌকো আর মরা ঘাসে
দুলুক সমুদ্রপ্রাণ আশায়
(এসো সঙ্গী হই)

চিত্রকল্প নির্মাণ একজন কবির জন্য প্রতিভাসঞ্জাত বিষয় এজন্য যে, পাঠকচিত্তে বর্ণিতব্য বিষয়কে কবি বস্তুসত্যের প্রায় অনুরূপ সংবেদ্যতায় মূর্ত করে তোলেন সার্থক চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কবির সৃজনক্ষম চেতনার সঙ্গে এই রূপাঙ্গিকটি একবারেই সন্নিকট পরিপূরক। চিত্ররূপময়তার সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, চিত্ররূপে দৃশ্যমান জগৎ অনুকৃতির সার্থক প্রয়াস আর চিত্রকল্প স্বজ্ঞাজাত আইডিয়া যেটির সঙ্গে কবিচিত্তের আদিউৎস বিজড়িত; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় প্রাণবান ও তৃতীয় প্রতীতি-প্রাপ্ত।

আহসান হাবীব *সারাদুপুর* কাব্যে চিত্রকল্প নির্মাণে সফল ও ব্যতিক্রম। তাঁর চিত্রকল্পসমূহে আত্মলীন কবিসত্তার ধ্যানময়তা প্রকাশ পেয়েছে। *সারাদুপুর*-এ চিত্রকল্পসমূহে একধরনের মেদুরতা, দৃশ্যময়তার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাঙ্ময় চিত্রকল্প :

১. যে নাগরী নারীর সাম্পান
ঘাটে ঘাটে
নূপুরের ধ্বনি তোলে
তার
কটাক্ষের ঝড়ো হাওয়া
কখন তুলেছে ঝড় এখানে। ঘাটের
নিবেছে সমস্ত আলো
মরা নদী নির্জনতা
(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

২. কবিতার লাবণ্যে শরীর তার সম্পন্ন
যদিও মানবীর তৃষ্ণা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে না
কখনো এবং এক মানবের তৃষ্ণা তাকে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যায়
স্পর্শ যার অনন্য

(তারা দু'জন)

৩. নিত্য কি দু'জন
দু'জনের ক্লান্ত চোখে কিছুই পড়িনি?
সুন্দর শোভন দুটি আভরণে সজ্জিত অথচ
জর্জরিত দু'টি ক্লিষ্ট হৃদয়ের প্রতিকৃতি
দেখিনি কি?

(স্বরূপে মহিমা তার)

৪. এবং জীবন্মৃত মানুষের ভীড়ে
আতঙ্কে ধ্বনি ওঠে যখন, সে হাসে
সম্রাটের করুণায় এবং দু'হাতে
কর্কশ দু'হাতে তার অন্নের আশ্বাস
আর বরাভয় ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পথের দু'ধারে তার রেখে যায় অপার বিস্ময়,
জয়ধ্বনি।

(সে আসে)

৫. এবং হৃদয়ে
যখন মাঝির ডাকে উচ্চকিত ভোরে কুয়াশা
সংসার সমুদ্রে কাঁপে
দৈনন্দিন স্রোতের ইশারা;

(স্বজন)

প্রকৃতি আহসান হাবীবের কবিতায় আদিসত্তার প্রতিরূপক। এই প্রকৃতি মানুষের অকৃত্রিম সরল ও স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতীক। অরণ্যানী-জীবনের প্রথম সঙ্গী হিসেবে প্রকৃতিই মানুষের পরম প্রতিবেশী। আহসান হাবীব সভ্যতার বিবর্তনের ধারাক্রমের সঙ্গে নিজের অবস্থান বিষয়ে সর্বদাই সচেতন। কারণ, সভ্যতাকে নির্মাণ করতে গিয়ে মানুষ প্রথমেই যে সত্তাটির সঙ্গে আপ্রথম বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে সেটি হলো প্রাণবান এই প্রকৃতিসত্তা। *সারাদুপুর* কাব্যে কবির প্রকৃতি-লগ্ন হবার প্রগাঢ় বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। এ-কারণেই তাঁর কাব্যে নদী, পাখি, নির্মল বায়ুপ্রবাহ, ভোর ও ভোরের নৈসর্গিক চিত্র, ফসল, আকাশ, জল, ঝড়,আলো-ছায়া, অন্ধকার ইত্যাদি অনুষঙ্গ কবির বাক্-ভঙ্গির সঙ্গেই মিশে আছে। এই প্রকৃতিকে কবির কবিতা ও কাব্যভাষা থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। প্রকৃতি তাঁর কাব্যে কখনো উপমা-প্রতীক ও রূপক অনুষঙ্গ হিসেবে, কখনো নস্টালজিক স্মৃতিময়তা, প্রবহমান সত্তা, নিরাভরণতা, সজীবতা, কখনা কখনো সায়াহ্নিক অবসাদে প্রাণের আরাম হিসেবে এসেছে। কতিপয় দৃষ্টান্ত —

১. এসো সেই দিগন্তে
যেখানে প্রসন্ন আকাশ আর কাঁচা মাটি সহজেই
সবার ইচ্ছের অনুরূপ

(এসো সঙ্গী হই)

২. সে আমার সঙ্গী হয়ে মাঝে মাঝে থাকতে চায় কাছে —
বর্ষার বিষণ্ন একটি সন্ধ্যা! আমি
কী তাকে উত্তর দেব, যখন ভাবতে বসি
অথবা যখন রূঢ়কণ্ঠে কিছু বলতে চাই;
ভরারোদে পাখা মেলে দেওয়া পাখিটা তখন বলে,
বড় দুঃখী — ওকে তুমি আরো দুঃখ দিও না
মেঘেরা রোদ বড় ভালোবাসে!
(রোদে-মেঘে)

৩. মনে পড়ে এক ছোট হাট
সামান্য পশরা
সামান্য দু'এক কড়ি হাতে নিয়ে বটের ছায়ায়
বেচাকেনা।
(উত্তীর্ণ প্রহরের গান)

৪. নিজের ফেরার আত্মার পাশে দূরে বহু দূরে
জ্যোৎস্নার যৌবন ঝরে;
দেবদারু শাখা
হাওয়া দেয় দুর্বিষহ আশার মুকুলে।
(মন বলে)

৫. স্তব্ধ কদমের ডালে ক্লান্ত হরিয়াল
পাখা নাড়ে —
মন বলে যাই
অকৃত্রিম সঙ্গীতের সুরে
ঘাটের বধূকে ডাকি;
(ঐ)

৬. যাই ফিরে যাই
যেখানে মানুষ মাঠ পথ পাখি পলাশ বকুল
অরণ্য বর্ষার জলে পাশাপাশি গা ধোয়
(ঐ)

সারাদুপুর-এর উপমা-উপমান ও রূপকচিত্রেও কবি প্রকৃতির ব্যবহার করেছেন। স্বকাল, রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অবস্থা এবং সমাজ-লগ্ন থাকার অদম্য ইচ্ছাও তাঁর এ-সমস্ত রূপক উপমানচিত্রের মধ্যে আভাসিত। আইউবি শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাকরুদ্ধ সময়ের ও সমাজমানসের বর্ণনায় কবি ব্যবহার করেছেন প্রাকৃতিক অনুষঙ্গবাহী রূপক। দৃষ্টান্ত :

১. ঝলকাবে বিদ্যুতের দু'একটা পাপড়ি
অমাবস্যা-হৃদয়ে আমার!
(নতুন কবিতা)

২. যে আছে আদিম সঙ্গী-তার
অমাবস্যা-হৃদয়ে নির্জনে
ফুল তোলে
(পুতুল)

৩. ঘরের পুরনো ছাতে
হয়তো দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন;
(নতুন কবিতা)

৪. এবং বিবর্ণ বকুল যুঁই পলাশ-ছলনা
পার হয়ে নিষ্প্রদীপ কুটীরের সব বেড়া
ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার
মলিনতা ধুয়ে নিয়ে এসো পরস্পর সঙ্গী হই।
(এসো সঙ্গী হই)

৫. পলাশপ্রসন্ন এই মাঠে মাঠে
বৈকালিক ভ্রমণের ছদ্মনামে
(স্বরূপে মহিমা তার)

উপর্যুক্ত ১ ও ২-সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'অমাবস্যা-হৃদয়' রূপকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থবির সময়ের প্রকাশক। নানা বৈরী অবস্থার মধ্যে স্বদেশ, জীবন ও মানসিকতার আপাত-স্থবিরতা এর মধ্যে রূপকায়িত। আবার, ৩-সংখ্যক দৃষ্টান্তে এই স্থবির সময়ের অবসান-কল্পে কবির আকাঙ্ক্ষা গতিমান, স্বপ্নভারাতুর সময়ের — 'হয়তো দেখা দেবে কোন বিহঙ্গ-মন'। ৪ ও ৫-সংখ্যক দৃষ্টান্তে 'পলাশ' রূপকী মাত্রা পেয়েছে। পলাশ উজ্জ্বল, রক্তাক্ত, বলা চলে বিপ্লবের প্রতীক। কিন্তু ৪-সংখ্যক দৃষ্টান্তে বারবার ব্যর্থ বিপ্লব ও স্বার্থান্বেষী এই প্রচেষ্টার বাইরে কবি নতুন দিগন্ত অতিক্রম করতে চাইছেন। আর অপনোদন চাইছেন আপাত-বিবর্ণ এই 'বকুলজুঁই পলাশ-ছলনা'-র। শেষ দৃষ্টান্তেও পলাশ-প্রসন্নতা মূলত কৃত্রিম নাগরিক আত্ম-পরিব্যাপ্ত জীবনের পরিচায়ক।

সারাদুপুর কাব্যে গোধূলি, সন্ধ্যা আবছায়াময় প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনা আছে। বলা আবশ্যক, কাব্যটির নামকরণ *সারাদুপুর* হওয়া সত্ত্বেও কবি দুপুর-বর্ণনার মধ্যে নয় বরং অতিক্রান্ত বেলার ধূসরতা ও অবসাদগ্রস্ততাকেই এই কাব্যে তুলে ধরেছেন। মনে হতে পারে, এটি কবির ব্যক্তিগত অবসাদগ্রস্ত ক্লান্তির চিত্র। কিন্তু কবির এ-ক্লান্তি মূলত সময়প্রবাহের সমকালীন জীবন-বাস্তবতার মধ্যেই প্রাপণীয়। '৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে উত্থান-পতন, স্বৈরশাসকের নানা অবরুদ্ধকর স্বদেশ-পরিস্থিতি এগুলোই মূলত কবির এই সায়াহ্নিক অবসাদগ্রস্ততার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। দুপুরের অভিজ্ঞতাকেই তিনি সায়াহ্নের ক্লান্তি ও বিষণ্নতায় অনুভব করেছেন। অর্থাৎ অতিক্রান্ত সময়ে তিনি অনতিক্রম্যতার বাস্তবতাজনিত অসহায়ত্বকে চিত্রিত করেছেন অনেকটা আত্মগত যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে। এ-কারণে 'উত্তীর্ণ প্রহর', বৈকালিকী, গোধূলি-লগ্ন কিংবা ধূপছায়াময় সান্ধ্য-বিষণ্নতা তাঁর বর্ণনাংশে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই ক্লান্তি ও ক্লান্ত-অনুষঙ্গ বারবার *সারাদুপুর*-এ এলেও কবি এর থেকে মুক্তি-প্রত্যাশী। এখানেই আহসান হাবীবের স্বাতন্ত্র্য। তিরিশি কবিদের ক্লান্তি ও অবসাদ এক ধরনের অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে এবং তিরিশি কবি এ-ক্লান্তির দর্শনে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন। ক্লান্তির ভেতরে থেকেই তিরিশের কবিরা প্রত্যক্ষ করেছেন জীবনের বহুপ্রান্তিক স্ফুরণ। আহসান হাবীব ব্যক্তি-নিমজ্জনের কবি নন। তাই তাঁর কবিতায় সন্ধ্যা, অপরাহ্ন, ক্লান্তি-অনুষঙ্গ এসেছে জীবনের

বাস্তবতা হিসেবেই। কিন্তু সর্বদাই কবি এর থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছেন। কবির বিশ্বাসও তাই দৃঢ়মূল : 'পাখির অলস দেহে ধীরে ধীরে খসে যাবে রাত/এবং রাত্রির শেষে যে ভোর আসন্ন তাকে চেনো তুমি।' (সূর্যসঙ্গ)।

ক্লান্তি, সন্ধ্যা ও অপরাহ্নিক বর্ণনার দৃষ্টান্ত :

১. আমার ক্লান্তিলগ্নে তুমি যখন কুঙ্কুম ছড়াও
আমার বিষণ্ন রাত্রিতে তুমি যখন তারা হয়ে জ্বলো
তখন আমি সান্ত্বনা পাই
(আশা রাখি কেননা)

২. আর আমি ক্লান্ত হই
আমিও বিব্রত হই
এবং অতঃপর
বিনিদ্র রাতকে আমিও ভালবাসতে শুরু করি।
(সেই সব মুখ)

৩. সেই ক্লান্ত বিব্রত কয়েকটি মুখ
সূর্যোদয়ে স্থির হবে আবার নতুন বিশ্বাসে
আবার নতুন উদ্যমে চঞ্চল এবং থরোথরো
সেই কটি মুখ
আবার তুমিই সারা শহরে ছড়িয়ে দেবে।
(তোমাকে মৃত জেনে)

৪. তবুও সন্ধ্যায়
ধুলোমাটি ঝেড়ে পুছে
এবং সস্নেহে
সমস্ত দিনের ক্লান্তি
ধুয়ে দিয়ে কাছে বসে
(স্বজন)

৫. যেখানে আঁধারের আজন্ম বসতি
সেখানে বিষণ্নবুক বিকেলের রোদে
রেখো না যৌবন।
(সূর্যসঙ্গ)

আহসান হাবীব নাগরিক কবি। কিন্তু নগর-সাধক নন। শেকড়-বিচ্যুত যে কৃত্রিম নাগরিকতা, তাকে তিনি দৃশ্যত পরিত্যাগ করেছেন। নাগরিক মানুষের ক্লান্তি ও বৃত্তময়তাকে কবি বিধৃত করেছেন। যেমনটি বিষ্ণু দে-ও *চোরাবালি* কাব্যে নগর কলকাতার বিরাট জনপ্রবাহকে দেখেছেন।[৮]

মহাকারণিক দফতরের গলিতে গলিতে
আর অপরাহ্নে ঘরে ফিরে যাবে কিছু সফলতা,
বিফলতা কিছু পার্কের বেঞ্চিতে
কিম্বা চা-খানায় অলস দু'হাতে
স্বাস্থ্য পান করে যাবে
(তোমাকে মৃত জেনে)

এরই সঙ্গে এসেছে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন, প্রাত্যহিক দিনাতিপাতের চিত্র, আছে নাগরিক স্বাস্থ্য-সচেতন বয়োবৃদ্ধ মানুষের বাক্যালাপ —

১. পূব পাশের রাস্তায় ই-পি-আর-টি-সি'র গর্জন
সাড়ে সাতটার জেট্ নামছে আকাশমাটি কাঁপিয়ে
পাশের বাড়ির আয়রন্ডচুল মেয়েটি এই মাত্র
বাইরে বেরুলো,
(অভ্যাগত)

২. আমার ডাক এলো নীচের অধ্যাপকবারান্দার আড্ডায়
পেপটিক আলসারের আলোচনাটা কাল শেষ হয়নি। (ঐ)

তীব্র নাগরিকতার মধ্যেও আহসান হাবীব মূলত ঐতিহ্য-সচেতন। বাঙালি জীবন, এর সমৃদ্ধ অতীত, গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই যে লোকজীবন — তার প্রতিও কবি ঐকান্তিক আগ্রহ পোষণ করেছেন। ফেলে আসা জীবনের এই প্রাচুর্যকে কবি আবার ফিরে পেতে চান। কারণ, কবি বিশ্বাস করেন অশুভ নগরায়ণের পরিণামেই সেই সামষ্টিক জীবন প্রনষ্ট হয়েছে। 'এই ঝড়ে অন্ধকারে' কবিতায় কবি তাই লোক-অনুষঙ্গের মাধ্যমেই বক্তব্যকে প্রকাশ করেন :

আমার
সব গেছে, ঘাটের ময়ূরপঙ্খী গেছে আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে
এখন বসে না কাক; তবু রাত্রিদিন
প্রহরীর মত দেখো জেগে আছে দিগন্ত আমার :

সাররিয়ালিস্টিক বর্ণনা *সারাদুপুর* কাব্যে কবি ব্যবহার করেছেন নাগরিক বর্ণবৈষম্যে, চেতন-অবচেতনের নীরক্ত ও অনুচ্চারিত সময়কে ধারণ করার অভিপ্রায়ে। 'অভ্যাগত' কবিতার সুপ্তি-জাগরণের মধ্যেই রাত্রি ও চৈতন্যের বিভ্রমকে কবি প্রকাশ করেন সাররিয়ালিস্টিক বর্ণনার মাধ্যমে :

দেখতে দেখতে ফ্রিজ এরিয়েল পাখার ব্লেড
আর পাই রেডিওর সারা গা
সোফা কার্পেট আর ফ্রেমে আঁটা পিকাসো
সবকিছু মিলে একটা আমলকির বাগান হয়ে গেলো।

আহসান হাবীবের কবিতার ভাষা উঁচুগ্রামে বাঁধা নয় এবং এ-ভাষার নিরাভরণ, প্রাঞ্জল ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের কারণেই তাঁকে মৃদুভাষী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আহমদ রফিক এই প্রশ্নটির অবতারণা করে রোমান্টিকতাকে কেবল কবিভাষার মধ্যেই সীমায়িত করে 'তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা এক পরিব্যক্তিজনিত ও পরিশোধিত রূপ নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে যা ক্লাসিকাল অর্থে আদৌ রোমান্টিকতা পদবাচ্য নয়'[৯] — এই মত প্রকাশ করেছেন। এই 'পরিব্যক্তিজনিত ও পরিশোধিত' রূপটি কী অভিধায় চিহ্নিত, এ-বিষয়ে আহমদ রফিক অবশ্য কিছু বলেননি। আসলে আহসান হাবীবের কবিভাষা বাংলা কবিতার

রোমান্টিক ঐতিহ্য থেকে বিন্দুমাত্র দূরবর্তী নয়। তাঁর কবিস্বভাবও রোমান্টিক কবিদের সমতুল্যই। বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ হয়ে যে কোমল প্রাঞ্জল ও মেদুর ভাষা বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল এবং রোমান্টিক স্বভাবী কবি-সাহিত্যকদের ভাবের বাহন হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত রূপ পেয়েছে আহসান হাবীবের কবিতার ভাষাও তারই অনুগামী। আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের ভাষার মধ্যে এই ভাষাভঙ্গির চরম উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কবিতায় আহসান হাবীব এবং শামসুর রাহমান এই মৃদুভাষার সার্থক উত্তরাধিকার। বাংলা কবিতার ক্লাসিক দার্ঢ্যিক সুশৃঙ্খল রূপটি মাইকেল হয়ে সুধীন্দ্রনাথে এসে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। পরবর্তীকালে এই ভঙ্গিটিই উচ্চগ্রামে অনুরণিত হয়েছে সিকান্‌দার আবু জাফর, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখের হাতে। আহসান হাবীবের কবিতার ভাষা প্রবহমান, চিত্রময়তাপ্রাপ্ত এবং ব্যঞ্জনাময়। অতৎসম, মৃদু ও পেলব শব্দাবলির ব্যবহার, চিত্রাত্মক ভাববাহী বর্ণনধর্মিতা, গতিময়তা ও গীতলতাপ্রাপ্ত কবির বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির জন্যই তাঁকে মৃদুভাষী কবি হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবার, বিষ্ণু দে-র মতো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-সংশ্লেষী ভাষাও তাঁর কবিতার ভাষাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা প্রদান করেছে, যদিও ব্যঙ্গ ও স্যাটায়ারের মধ্যেও আহসান হাবীব অপেক্ষাকৃত সংযমী ও নিম্নকণ্ঠী।

আহসান হাবীবের চেতনালোক সর্বদাই এক দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনের মধ্যে সমন্বয়কামী। সেটি হচ্ছে অবিকশিত নগর ও ফেলে-আসা গ্রামের জন্য নস্টালজিক অনুভূতি। আর তার সংযোগ-সেতু অথবা বিভাজন যা-ই বলা হোক না কেন, সেটি যেন কবির বহু-ব্যবহৃত প্রতীক-অনুষঙ্গ 'নদী'। কবি নগর-বাসিন্দা হলেও নাগরিকতার নিরেট বাস্তবতায় নিজেকে খাপ-খাওয়াতে পারেননি, আবার গ্রামের পূর্বতন অভিজ্ঞতায় ফিরে যেতেও পারেননি। কারণ, পূর্বতন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। পশরা-বাণিজ্য ও বণিকী সভ্যতা ক্ষুদ্র-বিকিকিনি বা মুনাফায় সন্তুষ্ট নয়। সে-কারণে কবির নস্টালজিক আত্মা সেই পরিতৃপ্ত চাহিদার মধ্যেই ফিরে যেতে চায়। 'উত্তীর্ণ প্রহরীর গান' কবিতায় আছে ছোট হাট, সামান্য পশরা, দু'এক কড়ি হাতে নিয়ে বটের ছায়ায় বেচাকেনার স্মৃতির কথা।

সুতরাং, আহসান হাবীব এই সমন্বিত সমাজ ও জীবন-ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের ইতিবাচক উত্তরণ কামনা করেছেন। *সারাদুপুর* কবির এই উত্তরণের চিহ্নকেই ধারণ করেছে উপমা-প্রতীক-রূপক ও প্রতিরূপকাশ্রয়ী জগতের আঙ্গিকায়নে। কবি-হৃদয়ের এই বৈকালায়ন আসলে আসন্ন-প্রত্যুষের প্রস্তুতিমাত্র।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মাসুদুজ্জামান, *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৭৪
২. আহমদ রফিক, 'আহসান হাবীব : কবি ও কবিতা' [ভূমিকা], *আহসান হাবীব রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ ১১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১২
৪. সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ পৃ. ৩৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৬. তুষার দাশ, *নিঃশব্দ বজ্র : আহসান হাবীবের কবিতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৫

৭. যেমন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৩) শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২), শামসুর রাহমানের *রৌদ্র-করোটিতে* (১৯৬৩)।

৮. বড়বাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক
আর দীর্ঘশ্বাস
(টপ্পা ঠুংরি)

৯. আহমদ রফিক, 'আহসান হাবীব কবি ও কবিতা' [ভূমিকা], *আহসান হাবীব রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. পনেরো।